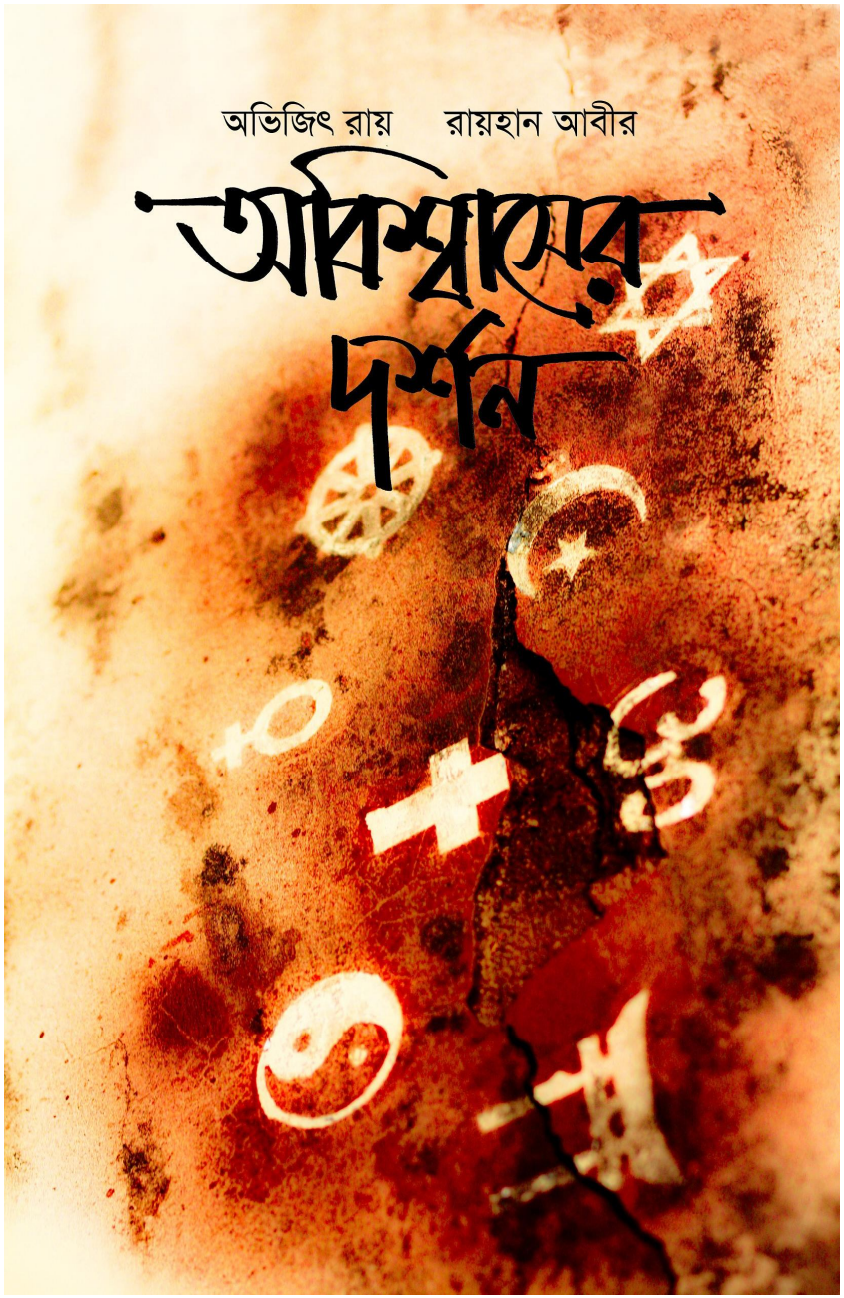
অভিজিৎ রায়
রায়হান আবীর
অবিশ্বাসের দর্শন

সংশয়বাদ, বস্তুবাদ, নিরীশ্বরবাদ এ অঞ্চলের জনমানসে নতুন কোনো দার্শনিক মতবাদ নয়। ভারতবর্ষে সংগঠিত ও প্রচারিত ধর্মগুলোর তুলনায় বস্তুবাদের ভিত্তি বরং অনেক প্রাচীন। চার্বাক দর্শন থেকে শুরু করে বৌদ্ধ দর্শন, সাংখ্য দর্শনসহ অনেক কিছুতেই বস্তুবাদী উপাদানের জাজ্বল্যময় সাক্ষ্য বর্তমান। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, সেই বলিষ্ঠ ঐতিহ্য আমরা ধরে রাখতে পারি নি। রাজশক্তি আর ক্ষমতাধরদের প্রাতিষ্ঠানিক চাপে, রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় নিপীড়ন আর নিগ্রহে সেই বস্তুবাদিতার উপাদান অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ঐতিহ্যের পুনরুত্থান আমরা যেন লক্ষ্য করছি একবিংশ শতকের নবীন অথচ প্রাজ্ঞ কিছু লেখকের হাত ধরে। তাদের আন্দোলন আজ বহির্বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে 'নতুন দিনের নাস্তিকতা' নামে।
অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীর প্রথমবারের মতো বহুল আলোচিত সেই নতুন দিনের নাস্তিকতার সাথে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই বইয়ের মাধ্যমে। তারা দেখিয়েছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে যেসব 'প্রমাণ' হাজির করা হয় তার সবগুলোই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক। মহাবিশ্বের উৎপত্তি হলো কীভাবে, প্রাণের অস্তিত্ব এলো কীভাবে, কীভাবেই বা জীববৈচিত্র্যের উদ্ভব হলো, প্রাণীজগতে এবং সর্বোপরি মহাজগতের প্রেক্ষাপটে মানুষের অবস্থান কোথায়, কোথায় থাকে আত্মা, কিংবা স্বর্গ, নরক- এ ধরনের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর জানার জন্য উন্মুখ মানুষ সহস্রাব্দকাল ধরে জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত ছিল। মানুষের জানা এবং না-জানা জ্ঞানের মধ্যবর্তী ফাঁকটুকুর মধ্যে তথাকথিত অলৌকিক সর্বশক্তিমান 'ঈশ্বর'কে বসিয়ে রেখেছিল বিভিন্ন ধর্মের মেওয়া বেঁচা সওদাগরেরা। কিন্তু এখন সময় পাল্টেছে, জানার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই জ্ঞানের 'গ্যাপ' পূরণে ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে 'ঈশ্বর' আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ একটি অনুকল্প।
কেবল ঈশ্বর নিয়ে দার্শনিক আলোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ না রেখে লেখকেরা সাহসের সাথে একে একে খুলে ফেলেছেন বহুকাল ধরে আবদ্ধ রুদ্ধ দুয়ারের ধাতব কপাটগুলো। তারা দেখিয়েছেন, একজন চিন্তাশীল মানুষের জন্য নাস্তিকতাই হতে পারে একমাত্র যৌক্তিক অবস্থান। 'অবিশ্বাসের দর্শন' তাই আমাদের চিরচেনা নিকষ কালো অন্ধকারের পরাধীন জগৎ থেকে আলোতে উত্তরণের এক স্বপ্নিল দর্শন।

লেখক হবার কোন বাসনা ছিল না কখনই। কিন্তু ছোট একটা স্বপ্ন হয়তো ছিল মনের গহীনে। স্বপ্নটি পাল্টে দেবার। সেই পাল্টে দেবার স্বপ্ন থেকেই ২০০১ সালের একদিন সমমনা কতজন লেখকদের নিয়ে তৈরি করে ফেলেছি মুক্তমনা সাইট (www.mukto-mona.com)। আজ বাঙালি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদীদের কাছে মুক্তমনা এক বিশ্বস্ত বন্ধুর নাম।
লেখালেখিতে পছন্দের বিষয় প্রথম থেকেই ছিলো আধুনিক বিজ্ঞান এবং দর্শন। প্রথম বই 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বেরিয়েছিলো ২০০৫ সালে (অঙ্কুর প্রকাশনী)। তারপর প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে ফরিদ আহমেদের সাথে বের হয় 'মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' (অবসর, ২০০৭)। আর শেষ বইটি- 'সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান' (২০১০) বেরিয়েছে শুদ্ধস্বর থেকে। আমি আমার পাঠকদের কাছে কৃতজ্ঞ যে, বইগুলো পাঠকদের ভালো লেগেছে। অনেকেই বইগুলোকে 'বাতিঘর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কেউবা আবার আরো বাড়িয়ে বলেছেন 'যুগান্তকারী'। তা যে কারণেই হোক না কেন, আমি এই বইগুলোর প্রতি আগ্রহ দেখে একটা ব্যাপার বুঝতে পারি যে, বাংলাদেশের শিক্ষার্থী, তরুণ-তরুণী ও সাধারণ মানুষেরা বিজ্ঞানবিমুখ নয় মোটেই, নয় দর্শনের প্রতি অনাগ্রহী। পেশায় প্রকৌশলী। পড়াশুনা করেছি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট), পরে পিএইচডি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর (এনইউএস)। বর্তমানে আমেরিকায় কম্পিউটার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছি। অবসর সময় কাটে বই পড়ে, লেখালিখি করে, গান শুনে, জীবনসঙ্গিনী বন্যার নিয়মিত বকা খেয়ে, আর নিশীথ রাতে আলোকিত স্বপ্ন দেখে - 'মনুষ্য জগতে আবার কাটবে অন্ধকারের ঘোর'...
অভিজিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)

অনলাইন ব্লগিং কমিউনিটি সামহোয়্যারইন.ব্লগ এ লেখালেখির শুরু। পরবর্তীতে অভিজিৎ রায়ের আমন্ত্রণে মুক্তমনায় লেখালেখির সাথে যুক্ত হই। বর্তমানে লেখায় ও ক্যাডেট কলেজ ব্লগে নিয়মিতভাবে অনিয়মিত ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শন সহ বিভিন্ন বিষয়ে লিখছি।
বরিশাল ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক সম্পন্ন করে গাজীপুরের ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি) থেকে তড়িৎ এবং ইলেকট্রনিক প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি ২০০৬ এ। এরপর থেকে প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানী হিসেবে ... চিকিৎসা পদার্থবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। -রায়হান আবীর

অভিজিৎ রায় এবং রায়হান আবীরের সুলিখিত-জনবোধ্য ভাষায় লেখা 'অবিশ্বাসের দর্শন' বইটি বাংলাভাষী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে শুরু করে সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী কিংবা মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিটি পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। আধুনিক বিজ্ঞানের একদম সর্বশেষ তত্ত্ব-তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে লেখা এ বই ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে আগামীদিনের জাত-প্রথা-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণীবৈষম্যমুক্ত সমাজ তৈরির স্বপ্ন দেখা বাংলাভাষী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের গণজোয়ারকে প্রেরণা যোগাবে।

অবিশ্বাসের দর্শন

অবিশ্বাসের দর্শন

অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীর

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১১

অবিশ্বাসের দর্শন । অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীর

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রকাশক শুদ্ধস্বর
৯১ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ সামিয়া হোসেন

মূল্য ৫০০ টাকা

ISBN 978-984-8972-02-1

Obishwaser Dorshon by Avijit Roy And Raihan Abir.
A publication of Shuddhashar
First edition February 2011

Price ৳ 500 $ 8 £ 8

এই বইটি *অভ্রতে* কম্পোজকৃত

ড. ম আখতারুজ্জামান
ছিলেন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিবর্তনবিদ্যা
নিয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণার অগ্রদূত;
যিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন
বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারে।

এবং

বন্যা আহমেদ
প্রয়াত ড. ম আখতারুজ্জামানের কাজের
সুযোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বিবর্তন বিজ্ঞানকে
জনপ্রিয় করেছেন তার বহুল আলোচিত
‘বিবর্তনের পথ ধরে’ বইয়ের মাধ্যমে।

বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখ দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ভূমিকা

কীভাবে এলাম আমরা? এই অসীম মহাবিশ্ব, কিংবা সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি- এগুলোই বা কেমন করে হলো? সবকিছুই কি একজনের ইশারায় একটি নির্দিষ্ট কারণে সৃষ্টি হয়েছে? কৌতূহলী মানুষ সহস্র বছর ধরে সন্ধান করছে এমন সব প্রান্তিক প্রশ্নের উত্তর। ক্ষুদ্র জীবনের সর্বক্ষণ চিন্তিত না থাকলেও প্রশ্নগুলোর কাঁপুনি সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমরা সবাই অনুভব করেছি। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে নিয়োজিত ছিলো প্রথাগত দর্শন। বিজ্ঞান বসে ছিলো সাইড লাইনে, সেই ঘোড়দৌড় উপভোগকারী হাজার দর্শকের একজন হিসেবে। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। প্রান্তিক এই সমস্যাগুলোর অনেকগুলোরই নিখুঁত সমাধান হাজির করতে পারে বিজ্ঞান। গতানুগতিক দর্শন নয় বরং বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দার্শনিকরাই আজ গহীন আঁধারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আজকের দিনে কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম বলতে বললে হকিং, ওয়াইনবার্গ, ভিকটর স্টেঙ্গর, ডকিন্স -এদের কথা সবার আগেই চলে আসে। এরা কেউ প্রথাগত দার্শনিক নন, কিন্তু তবুও দর্শনগত বিষয়ে তাদের অভিমত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সবসময়ই দর্শন আমাদের জ্ঞান চর্চার মধ্যমণি। কিন্তু প্রথাগত দর্শনের স্বর্ণযুগে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ছিলো তার সহচরী। এখন দিন বদলেছে- বিশ্বতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এমনকি অধিবিদ্যার জগতেও প্রাকৃতিকবিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা শুধু প্রবেশ করে নি, প্রথাগত দর্শনকে প্রায় স্থানচ্যুত করে দিয়েছে। অধিবিদ্যা জানতে হলে তো এখন আর 'স্পেশাল কোনো জ্ঞান' লাগে না। কেবল ধর্মের ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব আর ভাষার মধ্যে আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনো পথ পায়নি আধুনিক অধিবিদ্যা এবং প্রথাগত দর্শন। অন্যদিকে, আধুনিক পদার্থবিদ্যা আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে - সেটি অধিবিদ্যার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে। আমরা আজ জানি, মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে একজন প্রথাগত দার্শনিক কিংবা বেদ জানা পণ্ডিত কিংবা কোরান জানা মৌলভির চেয়ে অনেক শুদ্ধভাবে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন একজন হকিং কিংবা ওয়াইনবার্গ। ডিজাইন আর্গুমেন্ট নিয়ে অধিবিদ্যার গবেষকের চেয়ে বিজ্ঞান থেকেই অনেক ভাল দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন ডকিন্স বা শন ক্যারল। আজকে সেজন্য মহাবিশ্ব এবং এর দর্শন নিয়ে যে কোনো আলোচনাতে পদার্থবিজ্ঞানীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়, অ্যারিস্টটলের ইতিহাস কপচানো কোনো দার্শনিককে কিংবা সনাতন ধর্ম জানা কোনো হেড পণ্ডিতকে নয়। মানুষও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নানা রকমের দর্শনের কথা শুনতে চায়, তাদের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের দর্শন এবং চেতনার কথাগুলো বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি, যে দর্শন মহাবিশ্ব এবং জীবনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং ধর্ম ও প্রথাগত দর্শনকে তার আগের অবস্থান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

আমরা, এ বইয়ের দু'জন লেখকের কেউই প্রথাগত দার্শনিক নই। বরং আমাদের পেশাগত এবং একাডেমিক জীবনে খুব কঠোরভাবেই বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান এবং এর কারিগরি প্রয়োগ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার। কাজেই আমরা আমাদের 'বিজ্ঞানের চোখ' দিয়েই প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি। পাশাপাশি বহুদিন ধরেই মুক্তমনাসহ বিভিন্ন ব্লগে জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞান, বিবর্তন, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ, যুক্তিবাদসহ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলো নিয়ে লিখছি। বহু গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, এবং সংকলন সাময়িকীতে আমাদের ধ্যান ধারণা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি সেসব ধারণারই সুসংবদ্ধ এবং সুগ্রন্থিত প্রতিফলন। আমাদের এই বইটি অবিশ্বাস নিয়ে, এর অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে। আমরা দু'জনেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মুক্ত এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কেন অবিশ্বাসী, তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এ বিশ্লেষণ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনগড়া কোনো গল্প নয়, বরং তা হাজির করা হয়েছে একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সাম্প্রতিক তথ্যের নিরিখে। আমাদের এই গ্রন্থে ঈশ্বর ছাড়াই কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক তত্ত্ব এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা খুব জোরালোভাবে সমর্থিত। এছাড়াও মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে একটি আদি ঐশ্বরিক কারণ খণ্ডন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে কোনো ধরনের অলৌকিকতার উপস্থিতির অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ছাড়াও পদার্থের উৎপত্তি এবং শৃঙ্খলার সূচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে আমাদের বইয়ে। পাঠকেরা এই বইয়ের পথপরিক্রমায় জানতে পারবেন, মহাবিশ্ব কিংবা প্রাণ- কোনো কিছুর উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেই ঈশ্বরকে হাজির করার প্রয়োজন আজ আর পড়ে না। এর পাশাপাশি, আমরা আধুনিক জ্ঞানের নিরিখে সুচারুভাবে খণ্ডন করেছি প্যালের ঘড়ি এবং হয়েলের 'টর্নেডো থেকে বোয়িং' নামের ছদ্মবৈজ্ঞানিক ধারণাকে। জীবজগতের ডিজাইন এবং ব্যাড- ডিজাইন নিয়েও আলোচনা করেছি নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। শুধু তাই নয়, এই বইয়ে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উৎসেরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি যে, নাকের সামনে 'স্বর্গের মূলো' ঝোলাবার কারণে নয়, বরং ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই

পরার্থপরায়ণতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানব সমাজে এসে আরো বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। আমরা আশা করি, এ বইটি একজন সচেতন পাঠককে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতাই যে একজন বুদ্ধিমান মানুষের সবচেয়ে যৌক্তিক অবস্থান হতে পারে তা বোঝাতে সক্ষম হবে। সে কথা মাথায় রেখেই এ বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে 'অবিশ্বাসের দর্শন'। এই বইটির নাম 'অবিশ্বাসের দর্শন' যেমন হয়েছে, তেমনি এ বইয়ের নাম অবলীলায় হতে পারতো 'অবিশ্বাসের বিজ্ঞান', কিংবা 'প্রান্তিক বিজ্ঞান'। কারণ আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি, ঠিক যেমন স্টিফেন হকিং তার পদার্থবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দর্শনের প্রান্তিক সমস্যা আর আমাদের অস্তিত্বের রহস্য নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন তার অতি সাম্প্রতিক 'গ্র্যান্ড ডিজাইন'[1] বইয়ে, কিংবা জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স করেছেন তার 'গড ডিলুশন' বইয়ে[2] ।

বিশ্বাস এবং ধর্ম সবসময়ই একে অন্যের পরিপূরক, আমাদের সমাজে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও। আর এ নিয়ে বহু খ্যাতনামা দার্শনিকই চিন্তাভাবনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্পিনোজা থেকে ভলতেয়ার, ফুয়েরবাক থেকে মার্ক্স পর্যন্ত অনেকেই ভেবেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মডেলও তুলে ধরা হয়েছে অনেক। বাংলা ভাষায়ও খুব বেশি না হলেও বেশ কিছু বই লেখা হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, লিখেছেন হুমায়ূন আজাদ, লিখেছেন আহমদ শরীফ, লিখেছেন প্রবীর ঘোষ কিংবা ভবাণীপ্রসাদ সাহু। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজে এর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা মনে করি রিচার্ড ডকিন্সের 'ভাইরাসেস অব দ্য মাইন্ড' রচনাটির আগে জৈববৈজ্ঞানিকভাবে ধর্মের মডেলকে বোঝা যায়নি[3] । এই প্রবন্ধ থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতিগুলো অনেকটা ফ্লু-ভাইরাসের মতোই আমাদের সংক্রমিত করে। সেজন্যই ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ বহু কিছুই করে ফেলে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানের দার্শনিক ডেনিয়েল ডেনেট, ডকিন্সের এই ধারণাকেই আরো সম্প্রসারিত করে একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি - 'ব্রেকিং দ্য স্পেল' শিরোনামে[4] । একই ভাবধারায় ডেরেল রে সম্প্রতি লিখেছেন 'গড ভাইরাস'[5] । রিচার্ড ব্রডি লিখেছেন 'ভাইরাস অব দ্য মাইন্ড'[6] প্রভৃতি। ডকিন্স নিজেও ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপারগুলোকে মিম তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। 'সেলফিশ জিন'[7] এবং সাম্প্রতিক 'গড ডিলুশন' বইয়ে তার সে সমস্ত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য সেসব বই সংগ্রহ অনেকটাই দুরূহ। আমরা আশা করছি, আমাদের এই বইয়ের মাধ্যমে সে সব সাম্প্রতিক ধ্যান ধারণাগুলোর সাথে তারা পরিচিত হতে পারবেন। তবে, পাঠকেরা উপলব্ধি করবেন যে, আমরা এই বইয়ে ডকিন্সের 'মিম' এর বদলে ভাইরাস শব্দটিই অনেক বেশি ব্যবহার করেছি। এর কারণ হচ্ছে, ভাইরাস ব্যাপারটির সাথে সাধারণ পাঠকেরা পরিচিত, 'মিম' এর সাথে তেমনটি নয় এখনো। যে কোনো গতানুগতিক ধর্মে বিশ্বাস যে মানুষের মনে একটি ভাইরাস হিসেবেই কাজ করে সেটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'বিশ্বাসের ভাইরাস' নামের অধ্যায়ে। আমরা এই বইয়ে উল্লেখ করেছি, মানবমনে প্রোথিত বিশ্বাসগুলো আসলে অনেকটাই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো কাজ করে। এদের আক্রমণে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার বহু উদাহরণ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন-

> -নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট ঘাস ফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাস ফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, যার ফলে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে[8] ।
>
> -জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে উঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকেও কামড়াতে যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।
>
> -ল্যাংসেট ফ্লুক নামে এক ধরনের প্যারাসাইটের সংক্রমণের ফলে পিঁপড়া কেবল ঘাস বা পাথরের গা বেয়ে উঠা নামা করে। কারণ এই প্যারাসাইটগুলো বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধুমাত্র তখনই যখন কোনো গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে

---

1 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1St Edition edition (September 7, 2010)

2 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006

3 Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online: http://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html

4 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, 2007

5 Darrel W. Ray, The God Virus: How religion infects our lives and culture, IPC Press, 2009

6 Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House; Reprint edition, 2009

7 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976

8 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিয়ে বংশবৃদ্ধি করতে পারে[9]।

নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাস ফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানুষকে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো সংক্রমিত করে আত্মঘাতী করে তুলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের উপর, কখনোবা সিনেমা হলে, কখনোবা রমনার বটমূলে। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশজন ভাইরাস আক্রান্ত মনন 'ঈশ্বরের কাজ করছি' এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিলো প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই 'হলি টেররসঃ থিংকিং অ্যাবাউট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন' বইয়ে বিষয়টির উপর আলোকপাত করে বলেন, 'ধর্মই, মুহাম্মদ আত্তাসহ আঠারজনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধুমাত্র তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব'[10]। হিন্দু মৌলবাদীরাও একসময় ভারতে রামজন্মভূমি অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবড়ি মসজিদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় অপবিশ্বাসের অপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে 'ধর্মীয় নৈতিকতা', এবং এর পরবর্তী 'বিশ্বাসের ভাইরাস' অধ্যায়টিতে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, পৃথিবীতে শান্তি আনার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টিতেই যুগযুগ ধরে অবদান রেখেছে ধর্মগুলো, হয়ে উঠেছে বিভেদের হাতিয়ার। এই বইয়ে বহু পরিসংখ্যান হাজির করে দেখানো হয়েছে যে, ধর্ম নৈতিকতার একমাত্র উৎস নয়, কিংবা নাস্তিক হলেই কেউ খারাপ হয় না, যদিও আমাদের সমাজে এটাই ঢালাওভাবে ভেবে নেয়া হয় আর শেখানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা বিভিন্ন দেশের জেলখানার দাগী আসামীদের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে দেখিয়েছি যে, তাদের প্রায় সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী আস্তিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থাই এর সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। আল্লাহর গোনাহ্ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই আল্লাহ-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটি পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। এ বইয়ে ব্যক্তিবিশেষের পরিসংখ্যান যেমন দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি পাশ্চাত্য বিশ্বে সুইডেন বা ডেনমার্কের মতো 'প্রায় ধর্মহীন' দেশগুলোর সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও সেসব দেশে পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গার চেয়ে অপরাধপ্রবণতা কম, এবং সেখানকার নাগরিকেরা অনেক সুখী জীবন যাপন করছে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনের পাশাপাশি এ বইয়ে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে; ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কখনোই সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিৎ। এ ধরনের অনেক গভীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক আলোচনা বইটিতে স্থান পেয়েছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। কাজেই আগেকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধারা থেকে আমাদের বইটি অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নতুন একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছি বাঙালি পাঠকদের জন্য। আমরা মনে করি, এই আঙ্গিকে ঈশ্বর ও ধর্মালোচনা বাংলা ভাষায় এই প্রথম।

ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা এক ধরনের কুসংস্কার, এবং আমাদের মতে সবচেয়ে বড় কুসংস্কার। আর সে অপবিশ্বাসকে পুঁজি করে মানুষের আবিষ্কৃত ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগুলোও অযৌক্তিক মতবাদে পরিপূর্ণ। অন্য সকল ধরনের কুসংস্কার, অপবিশ্বাস, অযুক্তিকে বধে যেমন আমরা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হই বিনা দ্বিধায়, তেমনি ঈশ্বর এবং ধর্মালোচনাতেও আমাদের অস্ত্র হতে পারে বিজ্ঞান। বিবর্তন তত্ত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইতোমধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। যদিও অনেকেই ঢালাওভাবে বলে থাকেন, 'ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন', কিংবা 'বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব কোনোটাই প্রমাণ করা যায় না', কিংবা বলেন 'ঈশ্বরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করা গেলেও সেটা তার অনস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না' ইত্যাদি। এই বইয়ে আমরা দেখাবো স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া এই ধরনের প্রতিটি অনুকল্পই ভুল। আব্রাহামিক ধর্মের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেক কিছুই খুব ভালভাবে সংজ্ঞায়িত। এ বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে তার অনেক বৈশিষ্ট্যই আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে ভ্রান্ত কিংবা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরস্পরবিরোধী। তাছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের চোখে তা ধরা পড়ার কথা ছিলো। যেসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিত থাকার কথা এতোদিন আমরা শুনে এসেছি সেখানে তার অনুপস্থিতি অবশ্যই তার অনস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে। বিবর্তন তত্ত্ব রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত সকল ধর্মগ্রন্থের কল্যাণে আমরা জানতাম ঈশ্বর আদম-হাওয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্মগ্রন্থের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেছেন তিনি আমাদেরকে এক আদি মানুষ আদম হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদমের হাড় থেকে'[11]। আর অন্যদিকে বিবর্তন বলছে আদি এককোষী জীবের লক্ষ লক্ষ

---

9 এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

10 Bruce Lincoln, Holy Terrors: Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003

11 কোরান শরিফের ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ প্রভৃতি আয়াত দ্রষ্টব্য।

বছরের বিবর্তিতরূপ বর্তমান মানুষ। বিবর্তন তত্ত্ব বহু আগেই প্রমাণ করেছে, খ্রিস্টান পাদ্রি জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির বাইবেলীয় গণনা কিংবা ২৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নূহের প্লাবনের কোনো ধরণের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোনো ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্তার সুমহান উদ্দেশ্য। মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং প্রাণের উৎপত্তির পেছনে সুস্থিত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই দেওয়া সম্ভব, যা পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। এছাড়া প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার পরীক্ষা সহ বহু পরীক্ষায় ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার কথা থাকলেও সে ধরনের কিছুই কখনো পাওয়া যায়নি। ঈশ্বর আজ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে একটি 'ব্যর্থ অনুকল্প'। আমাদের চারপাশের জগতে অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। একটা সময় প্রাণের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য আত্মার শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো মানুষকে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ঈশ্বরের মতো আত্মাও একটি বাতিল অনুকল্প। বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনায় বলা হয়েছে, মানুষের অনুভূতি, জন্ম- মৃত্যু থেকে শুরু করে জগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আত্মার মতো অতিপ্রাকৃত কোনো কিছু আমদানির দরকার নেই।

ঈশ্বর অনুকল্পের পাশাপাশি এসেছে ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টিও। শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন আয়াত বা শ্লোককে বিভিন্ন চতুর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ইদানীং আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মানুষজনকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। মরিস বুকাইলি থেকে শুরু করে হারুন ইয়াহিয়া, জাকির নায়েক এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শমশের আলী সহ আধুনিক বিরিঞ্চিবাবাদের বিভিন্ন অপব্যাখ্যার জবাব দেয়া হয়েছে বইয়ের 'বিজ্ঞানময় কিতাব' অধ্যায়ে। একই রাশাদ খলিফা বর্ণিত কোরআনের তথাকথিত উনিশ তত্ত্বের নির্মোহ বিশ্লেষণ সংযুক্ত হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি কিভাবে রাশাদ খলিফা কোরআনের আয়াতে ইচ্ছেমতো নিজস্ব সংযোজন বিয়োজনের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআন টেম্পারিং করে নিউমেরোলজি বা সংখ্যাতত্ত্ব নামক অপবিজ্ঞানের সাহায্যে কোরআনকে অলৌকিক গ্রন্থ বানাতে চেয়েছেন।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নতুন কোনো ঘটনা নয়, এটি চলছে হাজার বছর ধরে। কিন্তু বিজ্ঞানের উপকার গ্রহণে আমরা যতটা না আগ্রহী তারচেয়ে বেশি আগ্রহী বিজ্ঞানের চেতনা পরিহারে। কিন্তু আমরা, নতুন দিনের নাস্তিকেরা উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সামান্যতম শ্রদ্ধা দেখাতে রাজি নই। আমরা মনে করি, ধর্মীয় বিশ্বাস আসলে অপবিশ্বাস যা সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী এবং সেই সাথে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা রোধের প্রধানতম অন্তরায় ছাড়া আর কিছু নয়। ছোটবেলার মগজধোলাইয়ের কারণে সমাজের বেশিরভাগ মানুষই মনে করে থাকেন, জীবনে শান্তি, পবিত্রতা এবং আনন্দ বজায় রাখার জন্য ধর্ম জরুরি। তাদের এই অনুভূতি আমরা কেড়ে নিতে চাই না, তবে আমরা দেখাতে চাই, ধর্ম বিশ্বাস ছাড়াও জীবন একই রকম কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারও বেশি নৈতিক, আনন্দ এবং পরিপূর্ণতায় ভরা। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের উক্তি দিয়েই বলি- 'You can be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually fulfilled.' এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বইটির শেষ তিনটি অধ্যায়ে।

২০০৪ সালে স্যাম হ্যারিসের লেখা 'বিশ্বাসের সমাপ্তি' বইটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যে সূচনা হয় নতুন এক আন্দোলনের[1 2] । পরবর্তীতে রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গর, ড্যানিয়েল সি ড্যানেট এবং ক্রিস্টোফার হিচেন্সের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা আরও ছয়টি দুনিয়া কাঁপানো বইয়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। উল্লেখিত নাস্তিকদের প্রতিটি বই আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে, যা কিছুদিন আগেও ছিলো অকল্পনীয়। এই আন্দোলন পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়েছে নতুন দিনের নাস্তিকতা (নব্য নাস্তিকতা বা New Atheism) হিসেবে। বাংলায় এখনো সে ধরনের কোনো আন্দোলন চোখে পড়েনি, যদিও আমরা প্রায়ই নিজেদের প্রবোধ দিতে উচ্চারণ করি যে, আমাদের সংস্কৃতিতে বস্তুবাদিতার উপাদান অনেক প্রাচীন। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে নতুন দিনের নাস্তিকতা আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্যই আমাদের এই বই। সকল ধরনের অপবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আশা করি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারবো যে, নতুন দিনের নাস্তিকতাই একজন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য আজ অবশ্যম্ভাবী শক্তিশালী একটি যৌক্তিক অবস্থান। আমরা আরও আশা করি বাংলাদেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আন্দোলনে শরীক হবার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণে এগিয়ে আসবেন। সেটা কেবল মাত্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনেই আমাদের সাহায্য করবে না, সাহায্য করবে কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে। রক্ষা করবে, ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বাধীন বাংলাদেশকে আরেকটি ছোট পাকিস্তান কিংবা তালিবানি আফগানিস্তান বানানোর অপচেষ্টা থেকেও।

আমাদের জীবন দীপান্বিত হোক!

অভিজিৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com)
রায়হান আবীর (raihan1079@gmail.com)

ফেব্রুয়ারি, ২০১১

---

[12] Sam Harris, The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 2004

সূচি

প্রথম অধ্যায়
বি-জ্ঞান এর গান ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল কিংবা মিঠা নদীর পানি ৪৪

তৃতীয় অধ্যায়
ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি ৮৭

চতুর্থ অধ্যায়
শুরুতে? ১১০

পঞ্চম অধ্যায়
আত্মা নিয়ে ইতং বিতং ১২৮

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিজ্ঞানময় কিতাব ১৬৪

সপ্তম অধ্যায়
ধর্মীয় নৈতিকতা ১৯২

অষ্টম অধ্যায়
বিশ্বাসের ভাইরাস ২২৬

নবম অধ্যায়
নতুন দিনের নাস্তিকতাঃ আগামীর ভাইরাসমুক্ত সমাজ ২৬২

পরিশিষ্ট
অক্কামের ক্ষুর এবং বাহুল্যময় ঈশ্বর ২৯৩
ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ? ৩০০
নাস্তিকতাও একটি ধর্ম (বিশ্বাস) হলে... ৩০৭
যাদের কাছে ঋণী ৩১১

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞান এর গান

নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে 'বাগান না করাও একটি শখ, ক্রিকেট না খেলাও একটি ক্রীড়া, কোকেইন সেবন না করাও একটি নেশা।'

- জুবায়ের অর্ণব[13]

মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর বিকাশ নিয়ে ২০০৫ সালে অভিজিৎ রায় (এই বইয়ের প্রথম গ্রন্থকার) লিখেছিলেন, 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' শিরোনামের বই[14]। বইটির 'লেখকের কথা' অংশে বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন,

> বিজ্ঞানের অবদান কি কেবল বড় বড় যন্ত্রপাতি বানিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনা? আমাদের স্কুল কলেজে যেভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হয় তাতে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ বড় বড় যন্ত্রপাতি বানায় বটে; তবে সেগুলো স্রেফ প্রযুক্তিবিদ্যা আর প্রকৌশলবিদ্যার আওতাধীন। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অভিযোজন মাত্র। আসলে বিজ্ঞানের একটি মহান কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য এখানেই। হ্যাঁ, জ্যোৎস্না রাত কিংবা পাখির কুজনের মতো বিজ্ঞানেরও একটি নান্দনিক সৌন্দর্য্য আছে, সৌকর্য্য আছে- যার রসাস্বাদন কেবল বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানমনস্ক সর্বোপরি বিজ্ঞানপ্রেমী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগান তার বিখ্যাত 'The Demon-Haunted World' বইয়ের ভূমিকায় এ কারণেই হয়তো বলেছিলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করাকে এক ধরনের বিকৃত মনোভাব বলেই আমার মনে হয়। যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, তখন সারা পৃথিবীর কাছে সে তার প্রেমের কথা প্রচার করতে চায়। এ বইটি আমার প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, বিজ্ঞানের সাথে আমার সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথা।

প্রাসঙ্গিক কারণে, ঠিক পাঁচ বছর পরের নতুন এই বইয়ে পুরোনো কথাগুলোই উঠে আসলো আবার। নিঃসন্দেহে এই বইটিও আমাদের প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে বিজ্ঞানের সাথে আমাদের সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথাই।

'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটি বেরুনোর পরে অনেকেই একে বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের একটি মাইলফলক হিসেবে দেখেছিলেন। এক বছরেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ড. শাব্বির আহমেদ, ড. বিপ্লব পাল, ড. হিরন্ময় সেনগুপ্ত, ড. শহিদুল ইসলাম, ড.বিনয় মজুমদারের মতো বরেণ্য লেখক এবং শিক্ষাবিদেরা বইটির রিভিউ করেছিলেন। সে সব রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে এনএফবি, অবজারভার, হলিডে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, মৃদুভাষণ, ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

কিন্তু যে ব্যাপারটি বলার জন্য এখানে এতো আয়োজন তা হলো, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণাগুলোর পাশাপাশি, শেষ অধ্যায়টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে 'ঈশ্বর অনুকল্প'টি নিয়েও নিরপেক্ষ আলোচনা ছিল । আর এখানেই দেখা দিয়েছিল একটি মজার সমস্যা। 'আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী' বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ। তিনি বইটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য প্রক্ষেপণের পরেও ভূমিকার শেষ দিকে একটি বাক্য জুড়ে দেন-

> ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয় এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক, তবে সে পথে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীকে নিরুৎসাহিত করা মোটেও উচিৎ নয় বলেই আমার মনে হয়।

এ এম হারুন অর রশীদ ' ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়' বলে যে উক্তিটি বইয়ের ভূমিকায় করেছিলেন তা খুব পরিচিত এবং জনপ্রিয় ধারণার প্রতিফলন। এ এম হারুন অর রশীদ থেকে শুরু করে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকেরা প্রায়ই আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে পার্থিব জ্ঞানের চর্চা করা, ঈশ্বর কিংবা এ ধরনের অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কখনোই কোনো অভিমত দিতে পারে না বিজ্ঞান। তাই ও নিয়ে টু-শব্দ করা বিজ্ঞান লেখকদের অনুচিত। কিন্তু সত্যই কি তাই?

---

[13] ব্লগার, ক্যাডেট কলেজ ব্লগ, http://www.cadetcollegeblog.com/arnob

[14] অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পুনর্মূদ্রণ ২০০৬)